কৃষি জলবায়ু

ইউনিট ৬

ভূমিকা

আবহাওয়া হলো কোন স্থানের বায়ুমন্ডলের সামগ্রিক অবস্থা। অর্থাৎ আবহাওয়া বলতে কোন স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুর চাপ, কুয়াশা ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থাকে বুঝায়। এমনিভাবে কোন স্থানের বা অঞ্চলের কৃষিকে প্রভাবিত করে এমন আবহাওয়ার ২৫-৩০ বছরের গড়কে কৃষি জলবায়ু বলে। কোন অঞ্চলের জলবায়ু সেই অঞ্চলের ফসল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষির উপর জলবায়ুর উপাদানের সামগ্রিক প্রভাব আছে। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, জলপাত, শিশির, তুষার পাত এবং কুয়াশা ফসল উৎপাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে স্থলভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে সেচ ছাড়াই অনেক ফসল চাষ করা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের ফলে খালবিল, নদী নালা, পুকুর ডোবা পানিতে ভরে যায় এবং প্রচুর মাছ জন্মায়। এই ইউনিটে কৃষি জলবায়ু, উপাদান, মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিকূল পরিবেশে ফসল ও পশুপাখি রক্ষা কৌশল, ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা ও ফসল মৌসুম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -৬.১ : কৃষি জলবায়ু ও জলবায়ুর উপাদান
পাঠ -৬.২ : বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব ও উপযোগিতা
পাঠ -৬.৩ : কৃষি জলবায়ুর উপযোগী উদ্যান, মাঠফসল ও গবাদি পশুপাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব
পাঠ -৬.৪ : ফসল উৎপাদন, গবাদি পশু ও পাখি পালনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
পাঠ -৬.৫ : প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল ও পশুপাখি রক্ষার কৌশল
পাঠ -৬.৬ : ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা ও ফসলের মৌসুম
পাঠ- ৬.৭ : ব্যবহারিক : (ক) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করণ বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয়
পাঠ -৬.৮ : ব্যবহারিক : বিভিন্ন ধরণের দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ ফসল ও ফসলের জাত চিহ্নিতকরণ

পাঠ-৬.১ কৃষি জলবায়ুর ও জলবায়ুর উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবহাওয়া ও জলবায়ু কি বলতে ও লিখতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কৃষির উপর জলবায়ুর উপাদানের প্রভাব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আবহাওয়া, জলবায়ু, জলবায়ুর উপাদান, জলবায়ুর প্রভাব

আবহাওয়া ও জলবায়ু কি ?

কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কোন স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হলে সে স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে প্রথমে জানা দরকার। আবহাওয়া বলতে কোন স্থানের দৈনন্দিন বায়ুমন্ডলের অবস্থা অর্থাৎ কোন স্থানের দৈনিক বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুর গতি ও চাপ, সূর্যালোক প্রভৃতির সামগ্রিক অবস্থাকে বোঝায়। আবার জলবায়ু বলতে কোন স্থানের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে বোঝায়। বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন। কারণ সারা বছরের জলবায়ুর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনা। কোন অঞ্চলের কৃষি জলবায়ু সেই অঞ্চলের ফসল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের কৃষি উৎপাদন প্রায় সম্পূর্নভাবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রাপ্ত বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। চাষাবাদের জন্য সময়মত পানির প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সমগ্রদেশে এখনও পানি সেচের তেমন সু-ব্যবস্থা নেই। ফলে চাষাবাদের জন্য আমাদের মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যে বৃষ্টিপাত হয় তার উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের দেশে দুই ধরণের মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। একটি দক্ষিন পশ্চিম মৌসুমী জলবায়ু যা গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিন পশ্চিম দিক হতে আর্দ্র-মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টিপাতের ফলে দেশের প্রধান ফসল ধান, পাট, আখ, চা প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হতে আগত শুষ্ক মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এসময় তাপমাত্রা কম থাকে। শীতকালে শীতকালীন ফসল যেমন-ডাল, তৈলবীজ, আলু, পেঁয়াজ, শীতকালীন শাক-সবজি ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলে সেখানে চা, রাবার, ইত্যাদির চাষাবাদ হয়। মৌসুমি জলবায়ুর দ্বারা এদেশের বনজ সম্পদও প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য রয়েছে এসব কারণে বিশেষ কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু ফসল ভাল জন্মে। কোন অঞ্চলে উদ্ভিদ ও কৃষি উৎপাদন দেখে সে স্থানে কৃষি জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা যায়। শীতকালের বার্ষিক গড় উষ্ণতা সর্বোচ্চ প্রায় ২৯° সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমান ১২০-৩৪৫ সে:মি: এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৩৫-৯৯% পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

১. ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুর গতির পরিবর্তন হয়। ফলে জলবায়ুতে পরিবর্তন ঘটে।

২. এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ শীতকাল।

৩. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে কাল বৈশাখীসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত এবং বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

কৃষি জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে আলোচনা

ফসল উৎপাদনের উপর জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের একক ও সমন্বিত প্রভাব রয়েছে। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন। এখানে সারা বছরই সমপরিমাণ উত্তাপ বিদ্যমান। দেশটি মৌসুমি অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাকৃতিক অনেক কারণ ফসল উৎপাদনের অনুকূল হলেও অনুন্নত ও মান্ধাতা আমলের কৃষি ব্যবস্থার দরুন এ দেশের কৃষি এখনো প্রায় সম্পূর্নভাবে প্রকৃতির খামখেয়ালীর উপর নির্ভরশীল। জমি চাষ থেকে শুরু করে শস্যবীজ গুদামজাতকরণ পর্যন্ত প্রায় সব কাজই এখানে জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

নিম্নে বাংলদেশের জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো:

দিবাদৈর্ঘ্য : অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক কারণ দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভাবিত হয়। এই কারণ সমূহের কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষ দ্বারা। সর্বশেষ আবিষ্কৃত বাহ্যিক প্রভাবক সমূহের একটি হচ্ছে দিনের দৈর্ঘ্য প্রযুক্তিগতভাবে ইহা পরিচিত ফটোপিরিয়ড নামে। আলোককাল বা ফটোপিরিয়ডের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া প্রদানকে বলে ফটোপিরিয়ডিজম। দিনের দৈর্ঘ্য যদিও একটি উদ্ভিদের কোন একটি বা সমস্ত অঙ্গকে রূপান্তরিত করতে পারে। তবুও এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হতে আজ পর্যন্ত প্রথমিক ভাবে ধারনা করা হয় এর দ্বারা উদ্ভিদের পুষ্পপ্রদান এবং ফলের উন্নয়ন প্রভাবিত হয়। দিনের দৈর্ঘ্য কম বেশী হওয়ার কারণে সালোকসংশ্লেষনের জন্য প্রাপ্ত মোট সময়ের ভিন্নতা ঘটে। ফলে সালোকসংশ্লেষন কম বেশি হয়। দিনের দৈর্ঘ্য বা আলোর হ্রাস বৃদ্ধির উপর অনেক উদ্ভিদের পুষ্পায়ন সম্পূনরূপে নির্ভর করে। এসকল উদ্ভিদ ক্রান্তীয় দিবা দৈর্ঘ্যর নিচে বা উপরে ফুল ধারন করে। আলো ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে দিনের দৈর্ঘ্য। দিনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১. স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদ ক্রান্তীয় দিবা দৈর্ঘ্যর নিচে ফুল দেয় তাদেরকে স্বল্প দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ বলে। যেমন: সয়াবিন, ফুলকপি, চন্দ্রমল্লিকা।
২. দীর্ঘ দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদ ক্রান্তীয় দিবা দৈর্ঘ্যর উপর ফুল দেয় তাদেরকে দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ বলে। যেমন:- চিনাবাদাম, লেটুস, গাজর ইত্যাদি।
৩. দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : যে কোন দৈর্ঘ্যের দিনে এসব ফসলের ফুল-ফল উৎপাদিত হয়ে থাকে, যেমন: টমেটো, তুলা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

তাপমাত্রা : জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্ভবত: তাপমাত্রা শস্যের সার্বিক বৃদ্ধি সাধনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের তাপমাত্রা মোটামুটি উষ্ণ। দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং বিশাল সমভূমির জন্য বাংলাদেশে শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য অনুভূত হয়না। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা শীতকালের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী। তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন শস্যকে গ্রীষ্মকালীন বা খরিপ শস্য এবং শীতকালীন বা রবিশস্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আউশ ধান, পাট, সয়াবিন, প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন শস্য। এসব শস্যের অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন। আমনধান, বোরোধান, গম, যব, সরিষা, তিল, মটর, মসুর তামাক প্রভৃতি শীতকালীন ফসল। তিল, তুলা, ভূট্টা প্রভৃতি উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। তবে আখ রবি ও খরিপ দুই মৌসুমেরই অন্তগর্ত।

আর্দ্রতা : বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিকে আর্দ্রতা বলে। কোন স্থানের আর্দ্রতা সেই স্থানের বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। যে বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি, সে বায়ু জলবায়ুকে অধিক প্রভাবিত করে। ফলে সেই এলাকায় দিনে খুবই গরম পড়ে এবং রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে। বায়ুর আর্দ্রতা সূর্যকিরণকে ভূপৃষ্ঠে আসতে অধিক বাঁধা সৃষ্টি করে বলে এ অবস্থা হয়। বর্ষাকালে অধিক আর্দ্রতার কারণে রোগবালাই এবং পোকামাকড় দ্বারা ফসল সহজেই আক্রান্ত হয়। শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে অর্থাৎ বাতাসে আর্দ্রতা অনেক কম থাকে। শীতকালে বাতাসের গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭২% থেকে ৮৫% হয় থাকে। অপরদিকে গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে এই আর্দ্রতা হয় ৮৩% থেকে ৯০% পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাতের উপরও আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভর করে। কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হলে সে অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং বৃষ্টিপাত কম হলে সে অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিন-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরপক্ষে শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি

বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজন। উদ্ভিদ এই পানি মাটি থেকে গ্রহণ করে। মাটিতে পানির প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত। ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ফসল জন্মে। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমান পূর্বদিক হতে পশ্চিমদিকে ক্রমশ্যই কমতে থাকে। সিলেটের লালাখালে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত (৬৪৯.৬ সে.মি.) হয় এবং রাজশাহী জেলার লালপুরে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত (১১৯.৮ সে.মি) হয়। দেশের বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ২৩০ সে:মি:।

গাছের সাবলীল বৃদ্ধি ও অধিক ফলন সঠিক মাত্রার পানি সরবাহের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই পরিমিত পানির প্রাপ্যতা বিভিন্ন এলাকায় এবং বিভিন্ন ঋতুতে শস্য বন্টনে তাপমাত্রার মত প্রভাব বিস্তার করে। কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে যে বৃষ্টিপাত হয় তা ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় জমি চাষ এবং খরিফ শস্য বোনা শুরু হয়। বৃষ্টিপাত প্রয়োজনের বেশী হওয়া সত্ত্বেও সময়মত এবং পরিমাণমত না হওয়ার কারণে প্রতি বছরই মাটিতে প্রয়োজনীয় পানির অভাবে শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

জলপাত : জলীয়বাষ্প শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে শিশিরাংকে পৌছালে বায়ুমন্ডলের ধূলিকনাকে আশ্রয় করে তা সহজেই ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকনায় পরিণত হয়। অত:পর সেই ক্ষুদ্র বরফ কনাগুলো বা জলকনাগুলো মাধ্যাকর্ষন শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্টে পতিত হয় তখন তাকে জলপাত বলে। কোন কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ১০° সেলাসিয়াস এর নীচে নেমে গেলেই অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে যা জলাপাত নামে পরিচিত।

জলাপাত সাধারনত দুই আকারের হয়ে থাকে- তরল আকার : হিমাংক শিশিরাংকের উর্ধ্বে থাকলে ঘনীভবনের ফলে যে জলপাত বা বারিপাত হয়, তা তরলাকার, কুয়াশা, শিশির ও বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। কঠিন আকার : শিশিরাংক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হিমাংকের নীচে থাকলে ঘনীভূত জলীয়বাষ্প হয় কঠিন আকার। যেমন: তুষার ও বরফরূপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে।

শিশির : রাত্রিতে তাপ বিকিরণ করে ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হলে ভূ-পৃষ্টের সংস্পর্শে উপরের বায়ু শীতল হয়। এর ফলে শীতল বায়ু বেশী জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না বলে অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ঘাস, গাছের পাতার উপর শিশিররূপে জমা হয়। শীতকালে ভূ-পৃষ্ঠ অধিকতর ঠাণ্ডা হয় বলে ঐ সময় শিশির বেশী পরিমাণে দেখা যায়। শীতকালে যখন মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের অভাব থাকে সে সময় এই শিশিরপাত মাটিতে কিছু পরিমাণ রস সরবারহ করে। এছাড়া যে সমস্ত ফসলের জন্য অধিক ঠাণ্ডার প্রয়োজন যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদির জন্য শিশিরপাত খুবই প্রয়োজন। আমন ধানের ক্ষেত্রে থোড় থেকে ছড়া বের হওয়ার কাজে এবং পরাগায়নে শিশিরপাত সাহায্য করে থাকে। অপরদিকে শিশির রোগ বালাই এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। গোল আলুর পাতা শিশির দ্বারা সিক্ত হলে নাবী ধ্বসা বা আলুর মড়ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশির ফসলের রোগবালাই সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। স্বল্প মেয়াদী সেচবিহীন যেসব ফসল চাষ করা হয় তাদের জন্য শিশির উপকারি। শিশির পরিমাপ করার জন্য ড্রোজোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

তুষারপাত : ভূ-পৃষ্ঠ এবং তার নিকটস্থ বস্তুর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ভাসমান জলীয় বাষ্প সরাসরি বরফকনায় পরিণত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় যা তুষারপাত নামে পরিচিত। বাংলাদেশে কোথাও তুষারপাত হয় না। এটি শস্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এদেশের কোন শস্যই তুষারপাত সহ্য করতে পারে না এমনকি খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া কোন কোন সময় আখ ও ধানের চারার বৃদ্ধি ভীষণভাবে ব্যাহত করে। শীতপ্রধান দেশে তুষারপাত সহ্য করতে পারে এমন সব শস্যের জাত প্রজনন দ্বারা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব শস্যের মধ্যে গম, যব, আলফালফা প্রভৃতি শস্যের বিভিন্ন জাত প্রধান।

কুয়াশা : কখনও কখনও জলীয়বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুস্তরে ভাসমান ধুলিকণাকে আশ্রয় করে এবং ঘনীভূত হয়ে ধোয়ার আকারে ভাসতে থাকে তখন তাকে কুয়াশা বলে। সাধারণত জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু কোন শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসলেই কুয়াশার সৃষ্টি হয়। এ দেশে আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত কুয়াশা দেখা যায়। কুয়াশার কারণে তেল ও ডাল জাতীয় ফসলের উপকার হয়। আবার অতিরিক্ত কুয়াশার কারনে আমের মুকুল নষ্ট হয়, রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল সমস্যা হয়। নৌপথে ফেরী চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হয়। শীতকালে সমুদ্রের বায়ু জীলয়বাষ্প পূর্ণ হয়ে কুয়াশার

সৃষ্টি করে। এ কুয়াশা পর্বত অপেক্ষা উপত্যকায় বেশি সৃষ্টি হয়। কারণ, বেলা বাড়লে সূর্যের উত্তাপে পানিকণাগুলো আবার জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুতে মিশে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ক্লাসে জলবায়ু উপাদানের তালিকা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে

সারাংশ

জলবায়ু কোন অঞ্চলের ফসল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা বনজসম্পদও প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের জলবায়র বিভিন্ন উপাদানগুলি হল দিবাদৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতা, জলপাত, শিশির, তুষারপাত ও কুয়াশা। ফসল উৎপাদনে জলবায়ুর উপাদানের প্রভাব রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে কয় ধরনের মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় ?

ক) ১ খ) ২

গ) ৩ ঘ) ৪

২। বাংলাদেশের জলবায়ুর ধরণ কেমন ?

ক) সমভাবাপন্ন খ) শীতল

গ) উষ্ণ ঘ) আর্দ্র

৩। জলবায়ুর সবচেয়ে বেশী প্রভাব হলো-

i) পশু সম্পদের উপর

ii) পরিবহন ব্যবস্থার উপর

iii) ফসল উৎপাদনের উপর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) ii ও iii খ) i ও iii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কৃষি জলবায়ুর উপাদান-

i) বায়ু ও আবহাওয়া

ii) দিবা দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা

iii) বায়ুর আর্দ্রতা ও জলপাত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ- ৬.২ বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব ও উপযোগিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমি জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌসুমি জলবায়ু, উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।

মৌসুমি জলবায়ু

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। আর এদেশের কৃষিতে মৌসুমি বায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম। "মৌসিম" একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ ঋতু। বাংলা মৌসুমি শব্দটি এসেছে এই মৌসিম শব্দ থেকেই এসেছে। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর যে পরিবর্তন তাকে বলা হয় মৌসুমি বায়ু। বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর দেশ। দু'ধরনের মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং অপরটি উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ বায়ুর উৎপত্তির কারণ পানি ও স্থলের উষ্ণতার তারতম্য। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের জন্য উত্তর গোলার্ধের কোন কোন স্থানে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যতাপ কম হওয়ায় উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। তখন দক্ষিণের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে উত্তরের নিম্ন চাপ অঞ্চলের দিকে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে এ বায়ু বাংলাদেশে আসে বলে একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলা হয়। কিন্তু শীতকালে এ বায়ু আসে উত্তর-পূর্ব দিক হতে, তাই একে বলা হয় উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু জলভাগের দিক থেকে স্থল ভাগের দিকে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। তাই এই বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত - একটি বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে, অপরটি আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বঙ্গোপসাগর হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় তা হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পক্ষান্তরে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থল ভাগ থেকে জলভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এতে জলীয় বাষ্প প্রায় থাকেই না। তাই এই বায়ু দ্বারা শীতকালে এদেশে অতি সামান্য বৃষ্টি হয়। সিলেটে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাধিক। মৌসুমি জলবায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যাধিক। কিন্তু এখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত সারা বছরব্যাপী বৃষ্টিপাত না হয়ে অধিকাংশ বৃষ্টিপাত কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই হয়। এ জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম এবং শীতকালে বেশ শীত পড়ে। এই জলবায়ুর অন্য এর একটি বৈশিষ্ট্য হল উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরের দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমশ কম। সাধারণত মৌসুমি জলবায়ু এলাকায় ৩টি ঋতু সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এগুলি হল: শীতল ও শুষ্ক শীতকাল, উষ্ণ ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও আর্দ্র বর্ষাকাল। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব : বাংলাদেশের কৃষি একান্তভাবেই মৌসুমি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর পানি প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে পানি সেচের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। কজেই কৃষি উৎপাদনের জন্য মৌসুমি জলবায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিচে বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ু গুরুত্ব বর্ণণা করা হলো -

১. জমি তৈরী, বীজবপন, বীজ গজানো, চারা রোপন, ফসলের পরিচর্যা ইত্যাদির জন্য মাটিতে রসের প্রয়োজন। মৌসুমি বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে যে পানি যুক্ত হয় তা দ্বারা এ সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যায়।

২. বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলসমূহ যেমন- পাট, চা, আখ ইত্যাদির উৎপাদন মৌসুমি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সময়মত ও পরিমাণমত বৃষ্টিপাত না হলে এই সকল কাঁচামালও ঠিকমত জন্মাবেনা। ফলে কৃষির সাথে সাথে শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. বর্ষা মৌসুমে মৎস্য চাষীরা মাছ আহরণ করে থাকেন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওর-বাওর প্রভৃতি পানিতে ভরে যায়। ফলে এসব জলাশয়ে প্রচুর মাছ জন্মায়।

৪. বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ হলো বনজসম্পদ যা গড়ে উঠেছে মৌসুমি বায়ুর কল্যাণে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এ বনজ সম্পদ গড়ে উঠেছে।

৫. আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্য একান্তভাবেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। মৌসুমি বায়ু অনুকূলে থাকলে কৃষিজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে রপ্তানি বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটে।

৬. মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সময়মত ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে ধান, পাট, তামাক, আখ, চা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষকের হাতে টাকা আসে ও সরকারের রাজস্ব, রেল ও অন্যান্য পরিবহন কোম্পানির আয় বাড়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি ঘটে।

৭. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে দেশে সমভাবাপন্ন জলবায়ু অর্থাৎ পরিমিত তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিরাজ করে যা কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৮. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে নদ-নদী পানিতে ভরে যাওয়ার ফলে নৌকা লঞ্চ স্টিমার প্রভৃতি চলাচলে সুবিধা হয়। ফলে কৃষিপণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অনায়াসে পরিবহন করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতি একান্তভাবেই মৌসুমি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। মৌসুমি বায়ু প্রতিকূল হলে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই আমাদের দেশের কৃষির উপর মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমি জলবায়ুর নির্ভর কৃষি বলা হয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর উপযোগিতা :

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রকই হল কৃষি। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জনগণের প্রায় ৫২% প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের ২১.৮৪% সরাসরি কৃষি থেকে আসে। আবার এদেশের বনজসম্পদ মৎস্য সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য সরাসরি কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ দেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও অনুন্নত সেচ ব্যবস্থার কারনে এখনও এখানের কৃষি মৌসুমি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রের সাফল্য অনেকাংশেই মৌসুমি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে দুই ধরণের মৌসুমি জলবায়ু রয়েছে।

১. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি জলবায়ু যা গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়।

২. উত্তর-পূর্ব মৌসুমি জলবায়ু যা শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিতে মৌসুমি জলবায়ুর উপযোগিতা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হতে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি জলবায়ু স্থলভাগে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে সেচ ছাড়াই এদেশে কৃষিকাজ করা যায়। গ্রীষ্মকালীন কৃষিজ ফসলগুলোর মধ্যে পাট, ধান, শাক-সব্জি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার ফলের মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, ডাল, নারিকেল ইত্যাদি।

২. শীতকালে উত্তর-পূর্ব শুষ্ক মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে তীব্র শীতপড়ে এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়। এই শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রচুর শীতকালীন ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন:- ধান,গম, তামাক, সরিষা, ডাল, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া ইত্যাদি।

৩. শীতকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি যেমন- লালশাক, পালংশাক, মুলা, শিম, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গাজর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

৪. মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে এদেশ নদী-নালা, খাল-বিল, পানিতে ভরে যায়। শীতকালে এসব জলাভূমি থেকে পানি সেচের মাধ্যমে প্রচুর ধান, গম, রবিশস্য জন্মানো হয়।

৫. মৌসুমি জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নদনদীগুলো পানিতে ভরে যায়। ফলে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা জমিগুলোর উর্বরতা বৃদ্ধি পায় যা প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

৬. বর্ষাকালে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওর, পুকুর-ডোবা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ জলাশয়গুলোতে এসময়ে প্রচুর মাছ জন্মায়। নদীগুলোতে প্রচুর ইলিশ ও গলদা চিংড়ি জন্মায়। ইলিশ মাছ উৎপাদনের জন্য মৌসুমি জলবায়ু অতুলনীয়।

৭. চা ও রাবার বাগান গড়ে উঠার জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। চা ও রাবার আমাদের অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে চা ও রাবার শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৮. দেশের পাট শিল্প, চা শিল্প, তামাক শিল্প ইত্যাদি শিল্পগুলোর পরিচালনার জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন। বাংলাদেশে মৌসুমি জলবায়ু বিরাজ করায় এ সকল কৃষিজ পণ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

৯. বাংলাদেশে বনভূমি গড়ে উঠার জন্য মৌসুমি জলবায়ুর অবদান অনেক বেশী। বাংলাদেশে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিরাজ করায় চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজীপুর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলাতে এদেশের বনভূমি গড়ে উঠেছে। এসব বনাঞ্চল থেকে প্রচুর বনজসম্পদ সংগ্রহ করা হয়।

১০. বাংলাদেশ উষ্ণমন্ডলে অবস্থিত হলেও মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে এখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে। যা কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষিতে মৌসুমি জলবায়র গুরুত্ব ও উপযোগিতা এর প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

বাংলাদেশের কৃষি একান্তই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল যেমন ফসল, মৎস্য চাষ কৃষিজ শিল্প, কৃষি পণ্য বাজারজাত করণ ইত্যাদি। শীতকালে উত্তরপূর্বে শুষ্ক মৌসুম বায়ুর প্রভাবে শীত পড়ে ফলে প্রচুর শীতকালীন ফসল জন্মে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয় ফলে আম, জাম, কাঠাল, লিচু, পাট, ধান শাকসবজি জন্মে। চা ও রাবার পাহাড়িয়া এলাকায় জন্মে কারণ এর জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর বিরাজ করায় বনভূমি গড়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শীতকালে কোন দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় ?

ক) উত্তর-পশ্চিম খ) দক্ষিণ-পূর্ব

গ) দক্ষিণ-পশ্চিম ঘ) উত্তর- পূর্ব

২। মৌসুম অর্থ কি ?

ক) কাল খ) সময়

গ) ঋতু ঘ) বায়ু

পাঠ- ৬.৩

কৃষি জলবায়ু উপযোগী উদ্যান মাঠফসল ও গবাদি পশুপাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্যান ও মাঠ ফসলের উপর জলবায়ুর প্রভাব জানতে পারবে;
- গবাদিপশু ও পাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কৃষি জলবায়ু, উদ্যান মাঠফসল, গবাদিপশু পাখি, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আলো।

ভূমিকা

বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন এখানে সারা বৎসরই প্রায় সমপরিমাণ উত্তাপ বিদ্যমান। জমি চাষ থেকে শুরু করে শস্যবীজ গুদামজাতকরণ পর্যন্ত প্রায় সব কাজই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। নিচে উদ্যান, মাঠ ফসল, গবাদি পশু ও পাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা করা হলো-

উদ্যান ও মাঠ ফসলের উপর জলবায়ুর প্রভাব-

তাপমাত্রার প্রভাব : তাপমাত্রা শস্যের সার্বিক বৃদ্ধি সাধনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে। এই তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শস্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন বা খরিফ শস্য এবং শীতকালীন বা রবি শস্য।

শীতকালীন উদ্যান ফসলের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ২০° - ৩০° সেলসিয়াস। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন উদ্যান ফসলের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ৩০°-৩৫° সেলসিয়াস, পাতা জাতীয় শাক সবজির দৈহিক বৃদ্ধি কম দিবসে ১২°-১৭° সেলসিয়াস পছন্দ করে। অধিক তাপে এদের পাতায় সঞ্চিত শর্করার পরিমান কম হয়। অতিরিক্ত তাপে লেটুস ও পালংশাক দ্রুত ফুল উৎপন্ন করে। গোল আলু, মিষ্টি আলু, গাজর, মূলা, শাল গম ইত্যাদিতে অতিরিক্ত তাপে শর্করার সঞ্চয়ের পরিমান কম হয় বলে ফলন কম হয়। তাপমাত্রা কম বা বেশী হলে ক্যারোটিন কমে গাজরের রং হালকা হয়। বেশী তাপমাত্রায় ফুলকপি, বাধাকপি, মুলার স্বাদ কম হয়। আউশ ধান, পাট, সয়াবিন, জোয়ার ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন ফসল শস্যের জন্য অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালীন ফসল ২৩.৮৯°-২৯.৪৬° সেলসিয়াস মাসিক গড় তাপমাত্রার সর্বাধিক ফলন দেয়। আমন ধান, বোরো ধান, গম, যব, সরিষা, ছোলা, মটর, মসুর, তামাক ইত্যাদি শীতকালীন ফসল। এসব ফসল মাসিক গড় তাপমাত্রা ১৬.৬৭°-১৮.৩৩° সেলসিয়াস এ অধিক ফলন দেয়। কিছু সংখ্যক ফসল যেমন তিল, চীনাবাদাম, তুলা, ভুট্টা প্রভৃতি উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। আখ, রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমের অন্তর্গত। ফলের উৎপাদন তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। ফুল ও ফল ধারণের সময় উপযোগী তাপমাত্রা না হলে ফুল ও ফল কম ধরে। বেশী তাপমাত্রায় অনেক ফল গাছের ফল ধারণ ব্যাহত হয়। আম, লিচু প্রভৃতি ফল গাছের ফুল বিকাশের জন্য কম তাপামাত্রার প্রয়োজন। তাপমাত্রা অনেক ফল গাছের ফুল উৎপাদনের সময়কে প্রভাবিত করে। আমের পুষপমঞ্জুরী গঠনের সময় তাপমাত্রা কম থাকলে পুরুষ ফুল বেশি হয়। দেশের একস্থান হতে অন্য স্থানের উষ্ণতার তেমন কোন তারতম্য না থাকলেও গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উষ্ণতার মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। এজন্য প্রায় সব রকম শস্য কম বেশী দেশের সব জায়গায় জন্মানো সম্ভব হলেও শীতকালীন শস্য গ্রীষ্মকালে অথবা গ্রীষ্মকালীন শস্য শীতকালে কতগুলো (উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যতীত) সাফল্যজনক ভাবে জন্মানো যায়না।

বৃষ্টিপাত : গাছের সাবলীল বৃদ্ধি এবং অধিক ফলন পরিমিত পানি সরবরাহের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই পরিমিত পানির প্রাপ্যতা বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন ঋতুতে শস্য বন্টনে তাপমাত্রার মতই অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শাক সবজি ও ফলের মধ্যে ৬০-৭০ ভাগই পানি। এ পানি গাছ বৃষ্টিপাত ও মাটির নীচ হতে গ্রহন করে। বিভিন্ন শাকসবজি ও

ফলের বীজ বৃষ্টিপাত ছাড়া গজায়না। মাঠ ফসলে বীজ গজানো থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত প্রভাব বিস্তার করে। জমি ভালভাবে চাষের জন্য মাটির জো থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত মাটিকে সে অবস্থায় এনে দেয়। ফসল পাকার পর বৃষ্টিপাত হলে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুষ্পায়ণের সময় বৃষ্টিপাত হলে পরাগায়ণ ব্যাহত হয়। বৃষ্টিপাত কম বেশি হলে শাকসবজি ও ফলের ফলন ও কম বেশি হয়। সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড় গুলিতে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে চা এর উৎপাদন ভাল। আবার তুলা চাষের জন্য মধ্যম বৃষ্টিপাত ও অধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে বোনা আউশ ও পাটের বীজ গজানোর জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। এসময় শীতকালীন সবজি লালশাক, পালংশাক, মূলা, শাল গম, ডাল জাতীয় ফসল, তেল জাতীয় ফসল, ফুলকপি-বাধাকপি জন্মে। কাল বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে যে বৃষ্টিপাত হয় তা আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। কারণ, এ সময় জমি চাষ ও খরিফ শস্য বোনার সময় শুরু হয়। শিশির মাটিতে কিছুটা পানি যোগ করে যা ফসলের জন্য ভাল। কুয়াশা ও তুষার পাতে ফসল ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কুয়াশা ও তুষারপাত ফসলের জন্য ক্ষতিকর। বেশি কুয়াশার কারণে ডাল জাতীয় ফসল জাবপোকা ও বিভন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

ফসলের উপর আলোর প্রভাব : সূর্যের আলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর অন্যতম প্রধান উপাদান। শস্যের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য আলোর প্রভাব অনস্বীকার্য। পর্যাপ্ত সূর্যের আলো উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষনের জন্য অপরিহার্য। অধিকাংশ ঘাস জতীয় শস্যের বীজের অংকুরোদগমের জন্য আলোর বিশেষ প্রয়োজন। আলো অনেক উদ্ভিদের ফুল ও বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। উদ্ভিদ জীবনের বিশেষ প্রক্রিয়া, যৌন-বংশ বৃদ্ধির উপর আলোর এরূপ প্রভাব বিস্তারকে ফটো পিরিয়ডিজম বলে। কিছু উদ্ভিদের শীষ, ফুল ও বীজ উৎপাদনের জন্য ১২ ঘন্টার বেশী আলোর প্রয়োজন। আবার কিছু উদ্ভিদের ফুল, ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্য ১২ ঘন্টার কম আলো প্রয়োজন যেমন: পাট। কিছু উদ্ভিদের পুষ্পায়ণে আলোর প্রভাব পড়ে না যেমন: তুলা, ভূট্টা, তিল, চিনাবাদাম ইত্যাদি।

গবাদিপশু ও পাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব

গবাদিপশু ও পাখি পালনে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট পরিমান তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন রয়েছে। গবাদিপশু ও পাখির ক্ষেত্রেও জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণ। গবাদিপশুর দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা অত্যাধিক কম বা বেশি হলে পশুর দৈহিক বৃদ্ধি খাদ্য গ্রহণ, প্রজনন, দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়। অতি বৃষ্টির কারণে দেশে বন্যার সৃষ্টি হলে গবাদিপশু পালনে যথেষ্ট বাঁধার সৃষ্টি হয়। বন্যার ফলে আবাসস্থল সহ খাদ্য সংকটও দেখা দেয়। এ সময় গবাদি পশুর নানা ধরনের রোগ বালাই দেখা দেয়। আর্দ্রতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়। গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পশু পাখির দেহে পানি শূন্যতা দেখা যায় এবং পশু ভারবাহী কাজ করতে পারে না। শীতকালে তাপমাত্রা অত্যাধিক কমে গেলে গরুর ক্ষুধামন্দাসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। যেমন- নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, তড়কা, গলাফুলা ইত্যাদি। আবার বর্ষা মৌসুমে পশুর ক্ষুরারোগসহ নানা ধরনের রোগ হয়। গবাদিপশু কৃমি ও বহি: পরজীবীরা আক্রান্ত হতে পারে। তাপমাত্রা গৃহপালিত পাখির উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং ডিম ছোট হয়। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা অত্যাধিক হলে মুরগি হিটস্ট্রোক করে মারা যায়। শীতের সময় বার্ডফ্লু, রানীক্ষেত, বসন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। তাপমাত্রা কমলে বা জলবায়ু পরিবর্তন হলে ডিম উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পায়। আলো ডিম উৎপাদনে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাঠফসল, উদ্যান ও গবাদি পশুর পাখির উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্দে শ্রেণিকক্ষে প্রতিবেদন জমা দিবে।

সারাংশ

ফসল উৎপাদনের ক্ষেতে জমিতে চাষ থেকে শুরু করে শস্যবীজ গুদামজাতকরণ পর্যন্ত সব কাজই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। যেমন : তাপমাত্রার প্রভাবের কারণে গ্রীষ্মকালীন শস্য শীতকালে শীতকালীন শস্য গ্রীষ্মকালে শীতকালনি শস্য গ্রীষ্মকালে জন্মানো যায় না। মাঠ ফসলের বীজ গজানো থেকে ফসল সংগ্রহ বৃষ্টিপাত প্রভাব বিস্তার করে। পুস্পায়নের সময় বৃষ্টিপাত হলে পরাগায়ন ব্যাহত হয়। প্রচুর বৃষ্টির কারনে সিলেটে চা উৎপাদন ভাল হয়। উদ্ভিদজীবনের বংশবৃদ্ধির জন্য আলোর প্রভাব বিস্তারকে ফটোপিরিয়ডিজম বলে। অন্যদিকে আর্দ্রতা উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বা কমে গেলে পশু পাখির দৈনিক বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহন, ডিম উৎপাদন, প্রজনন, দুধ উৎপাদন ব্যহত হয়। বৃষ্টিপাতের উপর পশুর খাদ্য যেমন, ঘাস, ভুট্টা উৎপাদন নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শীতকালীন উদ্যান ফসলের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা হলো-

ক) ২০-৩০° সে: খ) ৩০-৩৫° সে:

গ) ৩৫-৪০° সে: ঘ) ৪০-৪৫° সে:

২। বর্ষাকালে গবাদি পশুর কী রোগ হতে পারে?

ক) নিউমোনিয়া খ) জলাতঙ্ক

গ) ক্ষুরা রোগ ঘ) তড়কা

পাঠ-৬.৪ ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু ও পাখি পালনে জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু ও পাখি পালনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা।

ভূমিকা :

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর গোলার্ধে। বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গিয়েছে। তাই এদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে কিছু পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়িয়া অঞ্চল। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তরে। এদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের ভূখন্ড উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু। এর ফলে নদ-নদীর গতিপথ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, কালবৈশখী, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা দেখা যায়। জলবায়ুগত কোন কোন উপাদানগুলো ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী জলবায়ুগত উপাদানগুলো মধ্যে রয়েছে- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রোপকূল এলাকায় এর তীব্রতা বেশি। উপকূলের প্রায় ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রে যখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন তা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের আকারে স্থলভাগের দিকে আসে। এর ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থলভাগে ঢুকে পড়ে। তখন তাকে আমরা জলোচ্ছ্বাস বলি। তীব্রতা ও স্থানভেদে এই জলোচ্ছ্বাসকে কখনও বলা হয় টর্ণেডো কখনও বা হারিকেন বা সাইক্লোন। জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা কেমন তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে এই নাম দেওয়া হয়। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকার প্রায় ০.৮৩ মিলিয়ন হেক্টর বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের মাটির লবণাক্ততার প্রধান কারণ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভূমি প্লাবিত হওয়া। জলোচ্ছ্বাসজনিত কারণে লবণাক্ত পানি ফসলি জমিতে ঢুকে পড়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীকালের জন্য তা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব-মধ্যাঞ্চলের ফসল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘূণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় এমনকি ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রধানত বৈশাখ (মধ্য এপ্রিল) থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন-কর্তিক (নভেম্বর) মাসে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। বৈশাখ মাসে হলে তাকে প্রাক-খরিফ আর আশ্বিন-কর্তিক মাসে হলে তাকে প্রাক-রবি জলোচ্ছ্বাস বলা যায়। এই উভয় সময়েই কম-বেশি মাত্রায় তীব্র জোয়ারসহ জলোচ্ছ্বাসে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জলোচ্ছ্বাসের ফলে সাধারণত ৬-১২ ঘন্টা পর্যন্ত সমুদ্র বা নদীর অতিরিক্ত পানি জমির উপরে থাকে। তবে পানি সরে যাওয়ার পরও ক্ষতির প্রভাব থেকে যায় অনেকদিন পর্যন্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রউপকূলবর্তী ১৩টি জেলার প্রায় একশ থানা অর্থাৎ দেশের প্রায় $\frac{১}{৫}$ এলাকা জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরাসরি জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও জলোচ্ছ্বাসে সাথের ঘূর্ণিঝড়ে দেশের অভ্যন্তরে আরও সমপরিমাণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন এলাকা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়, মানুষ ও গবাদি পশু আহত হয় অথবা মারা যায়। জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকার পানি দূষিত

হয়, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিক মারা যায়, পশু খাদ্যের অভাব্ দেখা যায়, জীবিত গবাদিপশু উদরাময় এবং পেটের পীড়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ফসল ও অন্যান্য সম্পদ বিনষ্ট হয় বা ভেসে যায়, মাটিতে লোনা ধরে এবং জলাবদ্ধতার ফলে জমির ফসল ও গাছপালা মারা যেতে পারে। কোন এলাকা জলোচ্ছ্বাস কবলিত হলে সেখানকার জন্য তাৎক্ষণিক কাজের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান, উপকরণ সরবরাহ, যোগাযোগ সবগুলির সমন্বয়েই পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। তবে তাৎক্ষণিক উৎপাদনশীল করণীয়ের মধ্যে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক।

বন্যা

সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিল দিয়ে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি পানি বয়ে গেলেই বন্যা দেখা দেয়। বন্যা বাংলাদেশে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কোন কোন বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবার কোন কোন বছর বিভিন্ন সময়ে বন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়। বৃষ্টি জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এই মৌসুমী বায়ু উত্তরের পাহাড়ের গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হওয়াতে বৃষ্টির পানি নদ-নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় দক্ষিণ দিকে। কিন্তু নদীর পানি ধারণ ও অপসারণ ক্ষমতার তুলনায় পানির পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলসহ দেশের সমতল ভূমির অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়।

এতে দেশের ন্যূনতম ৫০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়। এতে কৃষি উৎপাদন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় ৪০-৭০%। আমাদের দেশের বন্যা দেখা দেয় সাধারণত বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে। যে কোন স্থানে বন্যা হওয়ার পর ফসল কৃষি উপকরণ, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, মৎস্য ও অন্যান্য কৃষি সম্পদ, জমি ও মাটির প্রচুর ক্ষতি হয়। জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায়, রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে, গো-খাদ্য পাওয়া যায় না, পানি দূষিত হয়, পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়, গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়, ঘাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, অনেক পশুর মৃত্যু হয়। কোন কোন এলাকায় আগাম বন্যার ফলে সময়মত জমি চাষ ও ফসলের বীজ বপন বা চারা রোপণও ব্যাহত হয়। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, বন্যায় কেবলমাত্র খাদ্য শস্যের বেলাতেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০-২৫ লক্ষ টন। এর সাথে সাথে নানা ধরনের আর্থ সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়।

খরা

খরা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ও মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খরার কারণে এদেশে ৩০-৭০% পর্যন্ত ফসলহানি হতে পারে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি হলে সেই অবস্থাকে খরা বলা হয়। যে মৌসুমে সাধারণত মাটিতে রসের এই ঘাটতি অবস্থা থাকে তাকে বলা হয় খরা মৌসুম। খরার প্রধান প্রধান কারণগুলি হল অনাবৃষ্টি, সেচের পানির অভাব, প্রখর রৌদ্রতাপ ও বেলে বা ঢালু জমিতে কোন আচ্ছাদন না থাকা। খরা অবস্থায় চারা গাছ খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খরাকে তীব্র, মাঝারি ও সাধারণ এই তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে সকল মৌসুমেই খরা দেখা দিতে পারে। বরেন্দ্র অঞ্চল ও গঙ্গা পলিমাটি এলাকার নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রতি বছর প্রচন্ড খরা দেখা দেয়। এ ছাড়াও সারাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে মাঝারি ধরনের খরা দেখা দেয়। গম, মসুর, সরিষা, গোল আলু, ধান, আখ, ফলমূল, শাক সব্জিসহ প্রায় সকল ধরনের ফসলেই খরায় গড়ে ৩০% ফলন কম হয়। খরা ফসলি জমি, পশু সম্পদ, মাছ ও পরিবেশের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। খরায় পানির অভাবে গাছ মারা যায়। ফসলের বৃদ্ধি কমে যায়, জমি প্রস্তুতিতে অসুবিধা হয়। বীজ বোনা যায় না ও জমিতে লবণাক্ততা বাড়ে। খরায় চারা গাছ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্ক গাছে ফুল-ফল ঝরে যায়। খরায় উপসর্গ হিসাবে গাছের পাতা বা কচি ডগা দুপুরে সাময়িকভাবে নুয়ে পড়ে বা সরু হয়ে যায়। পানির অভাবে মানুষ-পশু-পাখি ও মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁচা ঘাসের অভাব হয়, পানি দূষিত হয়, গবাদিপশু ও পাখি অপুষ্টিতে ভোগে, গবাদিপশু ও পাখির বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়, মাঠ ঘাটের ঘাস শুকিয়ে যায়, অধিক তাপে পশুপাখির অসহনীয় অবস্থায় সৃষ্টি করে, তাপ পীড়নে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়। পশু-পাখির খাদ্যের অভাব এবং রোগ বালাইও বেড়ে যায়। ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা খরা ছাড়াও বাংলাদেশের কৃষি শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কৃষিতে ক্ষতি হয় অপূরণীয়। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে শস্য বিন্যাসে প্রয়োজনীয় পুনবিন্যাস, দুর্যোগকালীন ফসল ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনবার্সন কার্যক্রম গতিশীল ও সু-সমন্বিত করে বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ফসল গবাদি পশুর ও পাখির বন্যার ও খরায় কি প্রবাব পড়ে তার প্রতিবেদন দিবে।

সারাংশ

ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা প্রভৃতি ফসল পশু ও পাখি পালনে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে শস্য বিন্যাসে প্রয়োজনীয় পুনবিন্যাস, দুর্যোগকালীন ফসল ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্যোগ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনবার্সন কার্যক্রম গতিশীল ও সু-সমন্বিত করে বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির মোকাবেলা করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহমান সাহেব বন্যার কারণে তার গবাদিপশু নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তার পশুর জন্য বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন।

১. রহমান সাহেব বিকল্প খাদ্য কী খাওয়ালেন?

ক) সাইলেজ খ) কাঁচা ঘাস

গ) ধান গাছ ঘ) ভূট্টা গাছ

২. রহমান সাহেবের পশু যে সমস্যায় পড়তে পারে-

(i) সংক্রামক রোগের

(ii) অপুষ্টির

(iii) স্বাস্থ্যকর পরিবেশের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল ও পশুপাখি রক্ষার কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিরূপ আবহাওয়ায় পশু পাখি রক্ষার কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিকূল, জলাবদ্ধতা, খরা, কৌশল।

প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল

প্রতিকূল আবহাওয়ায় উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের দ্বারা খাপ খাইয়ে নেয়। ফসল উৎপাদন সময়ে যদি আবহাওয়ার অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ফসলের ক্ষতি হয় তখন তাকে আমরা বলি প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া। প্রতিকূল বা বিরূপ জলবায়ুর সময়কাল খুব কম। কিন্তু এ স্বল্পকালীন অবস্থায় ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, অত্যাধিক গরম, প্রচন্ড ঠান্ডা ইত্যাদি প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়ার উদাহরণ। বাংলাদেশে প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া এবং সে আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল নিচে আলোচনা করা হল :

বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতায় ফসল রক্ষার কৌশল

১. অতিবৃষ্টি : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এ সময়ে কখনো কখনো একটানা কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে থাকে একে অতিবৃষ্টি বলে। অনেক ফসলের গাছের গোড়া নেতিয়ে বা হেলে পড়ে। এক্ষেত্রে গাছের চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে সোজা করে বাঁশের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। এ সময় শাক সবজির মাঠ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. অনাবৃষ্টি : যদি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ১৫ দিন বা এর বেশীদিন বৃষ্টি না হয় তখন আমরা তাকে অনাবৃষ্টি বলি। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য আমরা সেচ দিয়ে থাকি। বৃষ্টি নির্ভর আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে যদি অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তবে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে নিড়ানি দিতে হবে। শীতকালীন সবজি ক্ষেতে জাবড়া প্রয়োগ করে পানি সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. শিলাবৃষ্টি : বাংলদেশে সাধারণত মার্চ এপ্রিল মাসে শিলাবৃষ্টি হয়। শিলাবৃষ্টির কারণে বিশেষ করে রবি ফসল, যেমন: পেঁয়াজ, রসুন, গম, আলু ইত্যাদি নষ্ট হয়। শিলার আকার ও পরিমাণের ওপর ক্ষতি নির্ভর করে। ক্ষতি বেশি হলে এসব ফসল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। কিছু ফসল বাড়ন্ত অবস্থায় শিলার আঘাতে ডালপালা ভেঙে নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ভাঙা ডালপালা ছাটাই করে সার ও সেচ দিয়ে যত্ন নিলে ফসলকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

৪. জলাবদ্ধতা : অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে কোনো স্থান জলাবদ্ধ হয়ে পড়াকে জলাবদ্ধতা বলে। পাহাড়ি ঢলের কারণে জলাবদ্ধতায় হাওর অঞ্চলে বোরো ধান পাকার সময় তলিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় জমি থেকে ধানের শীষ কেটে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিষ্কাশন নালা কেটে জলাবদ্ধ জমি থেকে পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

খরা অবস্থায় ফসল রক্ষার কৌশল

খরা বাংলদেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতিবছরই শুকনো মৌসুমে খরা কবলিত হয়। বৃষ্টির অভাবে জনজীবনে অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করে। খাল-বিল, ডোবা-নালা, নদ-নদী শুকিয়ে যায় বা পানির পরিমাণ খুবই হ্রাস পায়। খরার কারণে প্রতি বছরই ব্যাপক শস্যহানি ঘটে। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়। ফসল ফলে না, ঘাসও শুকিয়ে যায়। খরা কবলিত অঞ্চলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল চাষ করলে বা লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদন করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হল :

১. উপযুক্ত ফসল বা ফসলের জাত ব্যবহার : খরা শুরু হওয়ার আগেই ফসল তোলা যাবে এমন স্বল্পায়ু জাতের অথবা খরা সহ্য করতে পারে এমন জাতের চাষ করতে হবে। যেমন: আমন মৌসুমে বিনা ধান ৭, ব্রি ধান ৩৩ এক মাস আগে পাকে। ফলে সেপ্টম্বর-অক্টোবর মাসের খরা থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। বিজয়, প্রদীপ গমের দুটি খরা সহনশীল জাত।

২. মাটির ছিদ্র নষ্টকরণ : খরা কবলিত এলাকায় বৃষ্টির মৌসুম শেষ হওয়ার পর মাটিতে অগভীর চাষ দিয়ে রাখতে হবে। এতে করে মাটির উপরিভাগের সুক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবে।

৩. অগভীর চাষ : অগভীর চাষ দিয়ে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করতে হবে। প্রতি চাষের পর মই দিয়ে মাটিকে আঁটসাট অবস্থায় রাখতে হবে। এতে মাটিতে পানির অভাব পূরণ হবে।

৪. জাবড়া প্রয়োগ : শুকনো খড় লতাপাতা, কচুরিপানা দিয়ে বীজ বা চারা রোপনের পর মাটি দ্বারা ঢেকে দিলে আর্দ্রতা সংরক্ষিত থাকে। এর ফলে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হতে পারে না। অনেক দেশে কালো পলিথিন শিটও ব্যবহার করা হয়। এতে আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

৫. পানি ধরা : যে অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম হয়, সে অঞ্চলে বৃষ্টির মৌসুমে জমির বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট নালা বা গর্ত তৈরি করে রাখা হয়। এর ফলে পানি গড়িয়ে জমি থেকে বাইরে চলে যায় না। মাটি কর্তৃক সম্পূর্ণ পানি শোষিত হয়।

প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়ায় পশু-পাখি রক্ষার কৌশল

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাপক সম্পদ ও ফসলের ক্ষতি ব্যতিতও মানুষ ও পশু পাখির জীবন বিপন্ন হয়। এসব দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া হয় সুদূর প্রসরী। গবাদি পশু এসব দুর্যোগের সময় ও পরবর্তীতে খাদ্যভাবে ভোগে ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক পশুপাখির জীবনহানি হচ্ছে। অনেক পশু খাদ্যভাবে মারা যাচ্ছে বা অপুষ্টিতে ভুগছে। আবার অনকে পশু রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে বা অকেজো হয়ে বেঁচে থাকছে।

খরায় পশুপাখি রক্ষার কৌশল

খরা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতিবছরই শুকনো মৌসুমে খরা কবলিত হয়। খরা মৌসুমে সবুজ ঘাসের অভাবে কৃষকেরা পশু খাদ্য হিসেবে মূলত খড়ের ওপরেই নির্ভরশীল থাকেন। কিন্তু পশুর স্বাভাবিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য ঘাস না খাইয়ে কেবলমাত্র কেবল খড়ই যথেষ্ট নয়। পশুকে কেবলমাত্র ছোবড়া জাতীয় খাদ্য খাওয়ালেই চলবে না । খড়ে অল্প পরিমাণ শর্করা রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অন্যান্য খাদ্য উপাদান অনুপস্থিত। তাই কেবলমাত্র খড় বিচালি খেলে পশুপাখি অনিবার্যভাবেই অপুষ্টির শিকার হয়। একারণে খরা পরিস্থিতিতে পশুপাখিকে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন। ধান, গম ইত্যাদি শস্য পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খরা মৌসুমে গৃহপালিত পাখির খাদ্যের বিরাট সমস্যা হয়ে থাকে।

খরা মৌসুমে পশুপাখির বিকল্প খাদ্য

খরা মৌসুমে সবুজ ঘাসের অভাব দেখা দেয়। এজন্য খরা মৌসুম আরম্ভ হওয়ার আগেই ঘাস দিয়ে হে বা সাইলেজ করে রাখা প্রয়োজন। খড়কে ইউরিয়া মোলাসেস্ প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো উত্তম। এর ফলে গবাদী পশু কেবল শুকনো খড়ের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্য উপাদান পাবে। সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফডার ট্রির পাতা গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন- ইপিল ইপিল, নীল, শণপাট, জিগা, কাঁঠাল, বাবলা, ডেউয়া, ডুমুর, মান্দার, কৃষ্ণচূড়া,

আম পাতা প্রভৃতি। বসতবাড়ির কাছাকাছি, সড়কের পাশে, পতিত জমিতে, বাঁধের ধারে, পুকুরের পাড়ে এধরনের গাছ লাগিয়ে রাখা যেতে পারে। এর ফলে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও খাদ্যসংকটের সময়ে এসব গাছের পাতা গবাদি পশুর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তদুপরি মনুষ্য খাদ্যের উপজাত দ্রব্যাদিও পশুর-পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন- গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, ডালের ভূষি, সরিষা বা তিলের খৈল প্রভৃতি। ঝোলাগুড় ফেলে না দিয়ে বা নষ্ট না করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে খরা মৌসুমে শুকনো খড়ের সাথে মিশিয়ে পশুপাখিকে খাওয়ালে বেশ সুফল পাওয়া যায়। খড় কুচি কুচি করে কাটতে হবে। তারপর ভাতের ফ্যানে খড় ভিজাতে হবে। ঐ খড়ের সাথে মানুষের খাদ্যের বিভিন্ন উপজাত প্রয়োজনমত মিশাতে হবে। ঐ মিশ্রণের সাথে যোগ করতে হবে ৫০ গ্রাম লবণ এবং ৩০০ গ্রাম ঝোলাগুড়। এভাবে তৈরী করা যাবে উৎকৃষ্ট মানের পশুখাদ্য মিশ্রণ। এই মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে পশু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাবে। এতে পশুর উৎপাদনক্ষমতা ও কর্মক্ষমতাও অক্ষুণ্ন থাকবে। খরা মৌসুমে ইউরিয়া মেলাসেস ব্লক তৈরি করে খাওয়ালে গবাদি পশুর খাদ্য চাহিদা মেটে। তবে গবাদি পশুকে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার পানি খাওয়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

খরা মৌসুমে পশুপাখির রোগ ব্যাধি

খরা মৌসুমে গবাদি পশু নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। একারণে সংক্রামক রোগের আক্রমণ ঠেকাতে নিয়মিতভাবে প্রতিষেধক টিকা দিতে হয়। খরা মৌসুমে গবাদি পশুর বহি: দেহের পরজীবী, যেমন- আটালি, উকুন এবং মাছির উপদ্রব অনেক বেড়ে যেতে পারে। একারণে এ মৌসুমে অত্যন্ত যত্নের সাথে পশুর শরীর ঘসে ঘসে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। পরজীবীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে পশু চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। খুব বেশি গরম পড়লে পশু-পাখি নিয়মিতভাবে গোসল করাতে হবে। পশুর অন্য যে কোন ধরনের রোগ লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

বন্যায় পশু পাখি রক্ষার কৌশল

বন্যা বাংলাদেশে নিয়মিত অতিথির মতই প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এর আগমন ঘটে। দেশের একটি ব্যাপক এলাকা বন্যা প্রবণ। বন্যায় এ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, অনেক প্রাণহানি ঘটে, ফসল ডুবে যায়। অনেক মানুষের জীবনহানিও ঘটে। অনেক পশু পাখি মারা যায়, স্রোতে ভেসে যায়। এসময়ে পশু পাখি লালন পালন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পাখির খাদ্য সংকট প্রবল আকার ধারণ করে। তদুপরি এই সময়ে পশু পাখির বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধির-উপদ্রব দেখা দেয়।

বন্যায় পশু পাখির আশ্রয়

বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকার মধ্য আবাসের জন্যই স্থানভাব দেখা দেয়। এর মধ্যে গবাদি পশুর জন্য স্থান পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময়ে পশু পাখি সংরক্ষণে প্রথম করণীয় হবে যথাসম্ভব উঁচু স্থানে এদের থাকার ব্যবস্থা করা। উঁচু সড়কের ধারে বা বাঁধের ওপরে রাখতে পারলেই উত্তম। উঁচু স্থানে আচ্ছাদন তৈরি করে এদেরকে বেঁধে রাখতে পারলে ভাল হয়। পশু পাখিকে কাঁদাপানিতে রাখা যাবে না। কারণ তাতে এদের পায়ে ঘা হবে। পশু যদি জলমগ্ন এলাকায় থাকে বা বারংবার বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে তবে নানা ধরনের রোগের আশঙ্কা থাকে।

বন্যায় পশু পাখির খাদ্য

চারদিক যখন জলমগ্ন থাকে তখন পশু পাখির খাদ্য সংকট চরমে ওঠে। পশুর জন্য ঘাস পাওয়া যায় না। লতাপাতা বা কচুরিপানা বেশি পরিমাণে খেলে রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। জলমগ্ন এলাকার পঁচা পানি খেয়েও পশুর রোগ হতে পারে। ঘাসের অভাবের কারণে পশু পাখির জন্য এসময়ে বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। খড়, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, খৈল প্রভৃতি পশু পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উঁচু স্থানে মাচা তৈরি করে তার ওপরে যত্ন সহকারে রাখলে খড় পঁচার ভয় থাকেনা। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন খড় পানিতে না ভেজে। খড় ছাড়াও অন্যান্য দানাদার খাদ্য এমনভাবে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে যেন তা বৃষ্টির পানিতে না ভেজে। বৃষ্টির পানিতে ভিজলে ঐসব খাদ্য স্যাঁতস্যেঁতে হয়ে যেতে পারে। আর এ ধরনের ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে খাদ্য খাওয়ালে পশু পাখির দেহে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

বন্যার সময় প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা, কলমিশাক, লতা-গুল্মাদি জন্মে। সবুজ ঘাসের অভাবে এসব কলমি শাক, কচুরিপানা বা লতাগুল্ম পশুকে খাওয়ানো যায়। কলাগাছের বাকলও গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। তবে এসব খাদ্য খেয়ে

অনেক সময় পশু পাখি উদরাময় সহ অন্যান্য পেটের পীড়ায় ভোগে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে মাঠে প্রচুর ঘাস গজিয়ে ওঠে। এসব ঘাস পশুকে খাওয়ানো অনুচিত। তবে দুই এক পশলা বৃষ্টি হলে বা মাঠ শুকানোর পর এসব ঘাস পশুকে খাওয়ানো যায়। তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে পশুকে কাঁঠাল পাতা, কলাপাতা, বাঁশপাতা, হিজলপাতা, বাবলা পাতা খাওয়ানো যায়। কচুরিপানা বা এসব ঘাস শুকিয়ে খাওয়ালে রোগব্যাধির আশংকা কম থাকে। এসব খাদ্য অল্প অল্প করে শুকালে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। এসব খাদ্য একসাথে বেশি খাওয়ানো যাবেনা। কারণ তাতে পশুর উদরাময় দেখা দিতে পারে। এমনকি পশুর শরীরে বিষক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। সম্ভব হলে পশুকে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানো যেতে পারে। ডোবা-নালা বা আবদ্ধ জলাশয়ের দূষিত পানি পশু পাখি কোনভাবে খাওয়ানো যাবেনা। তবে পশুকে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার নিরাপদ পানি খাওয়াতে হবে।

বন্যায় পশু পাখির রোগ

বন্যার সময় এবং বন্যা পরবর্তীকালে পশু পাখি বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন-তড়কা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, বাদলা, ডায়রিয়া, গাভীর বাঁটে ঘা প্রভৃতি। পশুপাখিকে অবশ্যই সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে। সম্ভব হলে বর্ষা মৌসুমে আগেই পশু পাখি সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া উচিত। বন্যার আগে টিকা দেয়া না থাকলে জরুরী ভিত্তিতে পশু সম্পদ বিভাগের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে পশু পাখিকে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্থ অবস্থাতেই পশুকে টিকা দেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সাধারণত রোগক্রান্ত পশু পাখিকে বাঁচানো যায় না। কোনভাবে বেঁচে গেলেও এসব পশু তার উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে অকেজো হয়ে যায়। আক্রান্ত পশুর চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে পশু চিকিৎসাকের পরামর্শমত ব্যবস্থা নিতে হবে।

জলোচ্ছাসে পশু পাখি রক্ষার কৌশল

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই সামুদ্রিক ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রোপকূল এলাকায় এর তীব্রতা অধিক। প্রায় প্রতিবছরই উপকূলের প্রায় ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রে যখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন তা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের আকারে স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসে। এর ফলে সমুদ্রের লোনা পানি স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি উঁচু হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই স্থলভাগে ঢুকে পড়ে। তখন তাকে জলোচ্ছ্বাস বলা হয়। জলোচ্ছ্বাসের ফলে মানুষের প্রাণহানি ঘটে, বসতবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ফসল বিনষ্ট হয়, পশু পাখি ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অনেক পশু পাখি মারা যায়। কিছু কিছু পশু মারাত্মকভাবে আহত হয়। আবার জলোচ্ছ্বাসের পরপরই নানা ধরনের রোগও দেখা দেয়। জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তীতে পশু খাদ্যেরও সংকট দেখা দেয় এবং অপরিচ্ছন্ন পানি খেয়েও অনেক পশু রোগাক্রান্ত হয়।

জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে পশুসম্পদকে রক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজন হল এদের জন্য যথাযথ আশ্রয়স্থল, খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা এবং এদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা। জলোচ্ছ্বাসের সংকেত পাওয়া গেলেই পশু পাখিকে আশ্রয়স্থানে নিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। সেখানে পশুপাখির জন্য উপযুক্ত খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। কাঁচা ঘাসের বদলে এসময়ে গবাদি পশু শুকনো খড় ও পাখিকে দানাদার খাদ্য; যেমন- চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, খৈল প্রভৃতি খাওয়াতে হয়। পশুকে হে বা সাইলেজ খাওয়াতে পারলেও ভালো হয়।

জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ের ফলে মানুষও যেমন মারা যায়, তেমনি নানা ধরনের প্রাণী ও পাখিও মারা যায়। প্রতিকূল অবস্থায় মৃত মানুষ, পশু, পাখির সৎকার করা অনেক সময় সম্ভব হয়না। মৃত প্রাণী নদী- নালা, খাল- বিল ও মাঠে- ঘাটে পড়ে থাকে। ফলে মৃত প্রাণী থেকে দুর্গন্ধ বের হয় এবং চারপাশের পরিবেশ দূষিত হয় এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। জলোচ্ছ্বাসের পর গবাদিপশু নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন- তড়কা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, বাছুরের বাদলা রোগ, গাভীর বাঁটে ঘা, ছাগল- ভেড়ার গুটি ও সর্দি- কাশি প্রভৃতি। তদুপরি দূষিত পানি খেয়েও পশু পাখি উদরাময়সহ নানা ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ঝড়- জলোচ্ছ্বাসে আহত পশু পাখির দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থানে রোগজীবাণুর সংক্রামণ ঘটে এবং অনেক রোগের আক্রমণ ঘটে।

অসুস্থ এবং আহত সকল পশুর চিকিৎসা এসময়ে খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় রোগ মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করতে পারে। দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় এ সময়ে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতার পাশাপাশি পশু চিকিৎসার জন্য টিমও

গঠন করা হয়। পশুর মালিকদের অবশ্যই এসব পশু- চিকিৎসক টিমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগের আগেই পশু পাখিকে সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পশুর দেহের ক্ষতের সুচিকিৎসা করতে হবে এবং ক্ষতস্থানে যাতে মাছি না বসে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কষ্ট করে হলেও পশুকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে। পশু যেন কোন অবস্থাতেই পঁচা বা দূষিত পানি না খেতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এভাবেই জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী পশু পাখি সংরক্ষণ করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া ফসল ও পশুপাখি রক্ষার কৌশল বর্ণনা করবে।

সারাংশ

জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, অত্যাধিক গরম প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি বা বিরূপ আবহাওয়ার উদাহরণ। খরায় উপযুক্ত ফসলের জাত, জাবড়া প্রয়োগ, মাটির ছিদ্র নষ্ট করে ফসলকে খরা থেকে রক্ষা করতে হবে। খরা মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হে বা সাইলেজ করে গবাদিপশুর খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। বন্যার কারণে ফসল তলিযে যেতে পারে। আগাম ফসল চাষ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিবছরেই জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। জলোচ্ছাসের সংকেত পেলেই গবাদিপশুকে সুবিধাজনক আশ্রয়স্থলে নিয়ে যেতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে সাধারণত কোন মাসে শিলাবৃষ্টি হয় ?

ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি খ) ফেব্রুয়ারি-মার্চ

গ) মার্চ-এপ্রিল ঘ) এপ্রিল-মে

২। খরায় গবাদি পশুর কোন রোগের প্রকোপ দেখা যায় ?

ক) বহি: দেহের পরজীবী খ) গলাফুলা

গ) বাদলা ঘ) ক্ষুরারোগ

৩। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ-

ক) ২.২৫ মিলিয়ন হেক্টর খ) ২.৫০ মিলিয়ন হেক্টর

গ) ২.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর ঘ) ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর

পাঠ-৬.৬ ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা ও ফসলের মৌসুম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দিবা দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ফসলের শ্রেণিবিভাগ লিখতে পারবেন;
- শস্য মৌসুম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- রবি ও খরিফ মৌসুমের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- রবি ও খরিফ শস্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আলোক সংবেদনশীলতা, ফসলের মৌসুম, ফটোপিরিয়ডিজম, দিনের দৈর্ঘ্য, রবি মৌসুম, খরিপ মৌসুম।

ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা

অনেকগুলো পারিপার্শ্বিক কারণ দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভাবিত হয়। এই কারণসমূহের কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের দ্বারা। সর্বশেষ আবিষ্কৃত বাহ্যিক প্রভাবক সমূহের একটি হচ্ছে দিনের দৈর্ঘ্য। প্রযুক্তিগতভাবে ইহা পরিচিত ফটোপিরিয়ড নামে। আলোক কাল বা ফটোপিরিয়ডে উদ্ভিদের সাড়া প্রদানকে বলে ফটোপিরিয়ডিজম। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে পুষ্পিত ও ফলবান উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার জন্য আলোক ও অন্ধকারের আপেক্ষিক স্থিতিকালের প্রতি উদ্ভিদের সংবেদনশীল তাকে বলে ফটোপিরিয়ডিজম। আলোর স্থিতি বা মেয়াদকাল গাছের বৃদ্ধিও পুষ্পায়ণে প্রভাব বিস্তার করে। আলোর মেয়াদকাল যত দীর্ঘ হবে পাতায় পতিত মোট আলোর পরিমাণও তত বেশী হবে। গাছের সবুজাংশে ধারণকৃত আলোর পরিমান যতবেশী হবে, গাছের বৃদ্ধিও তত বেশী হবে। ফসলের আলো সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ক্রান্তীয় দিবা দৈর্ঘ্য নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদে ফুল ফোটার সূচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দিবালোক থাকে যা অনেক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিম্নতম মাপকাঠি, আবার অনেক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উচ্চতম মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে তাকে ক্রান্তীয় দিবা দৈর্ঘ্যে বলে। গবেষণায় দেখা গেছে আলোক সংবেদনশীল অনেক উদ্ভিদের ফুল ফোটার জন্য দিবা দৈর্ঘ্যের উচ্চতম মাপকাঠি ১২ ঘন্টা। আবার অনেক উদ্ভিদে নিম্নতম মাপকাঠি ১২ ঘন্টা। কাজেই যেসকল উদ্ভিদে দিবা দৈর্ঘ্যে ১২ ঘন্টার যত কম হবে তত দ্রুত ফুল ফুটবে। একইভাবে যে সকল উদ্ভিদে ফুল ফোটার জন্য দিবা দৈর্ঘ্যের জন্য নিম্নতম মাপকাঠি ১২ ঘন্টা সে সকল উদ্ভিদে দিবা দৈর্ঘ্যে ১২ ঘন্টার যত বেশী হবে তত দ্রুত ফুল ফুটবে।

আলোকের দৈনিক স্থিতিকাল অনুসারে গার্নার ও এ্যালার্ড উদ্ভিদকে দুইভাগে ভাগ করেন-

১. **আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ;**
২. **আলোক অসংবেদনশীল উদ্ভিদ।**

১. **আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ :** যে সকল উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনের জন্য দিনের আলো গুরুত্বপূর্ণ সে সকল উদ্ভিদকে আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ বলে। যেমন- চন্দ্রমল্লিকা, ব্রি ধান ৩৪।

এদেরকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় :

i) খাটো দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনের জন্য কম দিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন তাদেরকে খাটো দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ বলে। এক্ষেত্রে এ সকল উদ্ভিদের জন্য রাতের দৈর্ঘ্য যত অধিক হবে এ সকল উদ্ভিদ তত দ্রুত ফুল ধারণ করবে। দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টার বেশি হলে এ সকল উদ্ভিদের ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টা অপেক্ষা যত কম হবে এসব উদ্ভিদের তত তাড়াতাড়ি ফুল ফুটবে। যেমন: শীতকালিন শাকসবজি ও ফুল , তামাক, সয়াবিন, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, কসমস ইত্যাদি।

ii) দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনের জন্য বেশি দিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। তাদেরকে দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ বলে। সাধারণত এসব উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনের জন্য দৈনিক ১২ ঘন্টার বেশি দিবা দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। কাজেই দিবা দৈর্ঘ্য ১২ ঘন্টা অপেক্ষা যত বেশি হবে এ সকল উদ্ভিদের তত দ্রুত ফুল উৎপাদন হবে। বসন্তকালীন শস্যসমূহ, আলু, মূলা, বাঁধাকপি, পালংশাক, লেটুস, যব, ঝিঙা, মটর, ছোলা, বার্লি ও অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফুল এর উদাহরন।

২. **আলোক অসংবেদনশীল বা দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ উদ্ভিদ :** সে সকল উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনের জন্য দিবা দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি কোন প্রভাব বিস্তার করে না তাদেরকে আলোক অসংবেদনশীল বা দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বলে। প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা বা সর্বক্ষণ আলো প্রয়োগ সত্ত্বেও এদের ফুল ধারণের কোনরূপ সময়ের পরিবর্তন হয় না। যেমন- চিনা বাদাম, টমেটো, মরিচ, ঢেঁড়স, ভূট্টা, বি আর-৩ ধান, তুলা, শসা, কয়েক প্রকারের কুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলোক পর্যায়ের প্রভাবেই উদ্ভিদ যৌন-অঙ্গ গঠন করে ফুল এবং ফল উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে আলোক-পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটালেও ফটোপিরিয়ডিজমের উপর কোন প্রভাব দেখা যায় না। এই অবস্থাকে বলা হয় "আলোককালীন আবেশ"।
উপরোক্ত উদ্ভিদ ছাড়াও গার্ণার ও এলার্ড ১৯৪০ সালে মধ্যবর্তী উদ্ভিদ নামে এক প্রকার উদ্ভিদের বর্ণনা দেন। এ সকল উদ্ভিদ প্রত্যহ ১২-১৪ ঘন্টা সময়কাল ব্যাপী আলো পেলে স্বাভাবিক সময়ে ফুল প্রদান করে। এই সময় কালের অধিক বা অল্প সময় আলো দ্বারা প্রভাবিত হলে প্রজনন বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণ : *Mikania scandens.*

ফটোপিরিয়ডিজমের তাৎপর্য

ব্যবহারিক উদ্ভিদে ফটোপিরিয়ডিজম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। কারণ, এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এক ঋতুর শস্য অন্য ঋতুতে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এক ঋতুর শস্য অন্য ঋতুতে উৎপাদন করা সম্ভব হওয়ায় কৃষিভিত্তিক দেশে খাদ্য সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করে সামগ্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের ফসল মৌসুম

শস্য উৎপাদন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব ছাড়াও শস্য মৌসুম দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত বিশেষ বিশেষ ফসলের জন্য বিশেষ বিশেষ মৌসুম উপযোগী। শস্য উৎপাদন বিচারে বাংলাদেশে প্রতি ছয় মাসকে এক মৌসুম ধরে সমগ্র বছরকে দু'টি প্রধান শস্যমৌসুমে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. **রবি মৌসুম :** বাংলাদেশে রবি মৌসুম নভেম্বর মাস থেকে এপ্রিল (মধ্য আশ্বিন-মধ্যে চৈত্র) পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশে এটাই শুষ্ক মৌসুম। এই মৌসুমে সাধারণত বৃষ্টি বিরল বলে ফসলের আবাদের জন্য পানিসেচ নিতান্তই প্রয়োজন। শুষ্ক এবং অনার্দ্র আবহাওয়ায় ও অল্প তাপমাত্রায় রবিশস্য উত্তমরূপে জন্মায়। ছোলা, মসুরি, খেসারি প্রভৃতি কয়েকটি রবিশস্য সেচ ছাড়াও চাষ করা যেতে পারে। এদের বৃদ্ধির জন্য মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা সংরক্ষণই যথেষ্ট।

সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে- যে সকল শস্য তাদের শারীরিক বৃদ্ধি এবং ফুল, ফল উৎপাদনের অধিকাংশ সময় রবি মৌসুমে অতিবাহিত করে তাদেরকে রবিশস্য বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ : শীতকালীন ধান, গম, গোল আলু, সরিষা, বার্লি, তামাক, মটর, ছোলা, মসুরি, শালগম, গাজর, বীট, টমেটো, সীম, লাউ, পালং শাক, ধনে প্রভৃতি।

২. **খরিফ মৌসুম :** মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত (মধ্য চৈত্র-মধ্য আশ্বিন) এই মৌসুমের শস্য সময়সীমা বিস্তৃত। বাংলাদেশে এটাই উষ্ণতম মৌসুম। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য এই শস্যমৌসুমের বৈশিষ্ট্য এবং প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলেই এই মৌসুমে পানিসেচের তেমন প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের শুরুতেই এই মৌসুমের আগমন হয় এবং আর্দ্রতা বিহীন উত্তর-পূর্বে বায়ু প্রবাহ এর সমাপ্তি ঘোষণা করে।
সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে- "যে সকল শস্য তাদের শারীরিক বৃদ্ধি এবং ফুল-ফল উৎপাদনের অধিকাংশ সময় বর্ষা মৌসুমে অতিবাহিত করে তাদেরকে খরিপ শস্য বলা হয়।"
উদাহরণ : আউশ ধান, পাট, কলা, চাল কুমড়া, করলা, কাকরোল, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, পুঁইশাক, ধুন্দল, মিষ্টি কুমড়া ঢেঁড়শ, পটল প্রভৃতি।

রবিশস্য ও খরিপ শস্যের মধ্যে পার্থক্য

রবি শস্য	খরিফ শস্য
১। রবি মৌসুমের ফসল রবি শস্য নামে অভিহিত হয়। ২। রবি শস্য উৎপাদনে পানির চাহিদা কম থাকে। ৩। রবি শস্য সাধারণত স্বল্প তাপমাত্রায় ভল জন্মে। ৪। রবি শস্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ৫। রবি শস্য ছোট দিনের দৈর্ঘ্যে ভাল জন্মে। ৬। রবি শস্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম। ৭। রবি শস্যে শিলাবৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম। ৮। আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় রবি শস্যে কীট-পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণের সম্ভাবনা কম। ৯। রবি শস্যে কীট-পতঙ্গ ও রোগ-বালাই দমনের ব্যয় অনেক কম।	১। খরিফ মৌসুমের ফসল খরিপ শস্য নামে অভিহিত হয়। ২। খরিফ শস্য উৎপাদনে পানির চাহিদা বেশী থাকে। ৩। খরিফ শস্য সাধারণত অধিক তাপমাত্রায় ভাল জন্মে। ৪। খরিফ শস্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে সক্ষম। ৫। খরিফ শস্য বড় দিনের দৈর্ঘ্যে ভাল জন্মে। ৬। খরিফ শস্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। ৭। খরিফ শস্যে শিলাবৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। ৮। আবহাওয়া আর্দ্র থাকায় খরিপ শস্যে কীট-পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণের আশংকা বেশি। ৯। খরিফ শস্যে কীট-পতঙ্গ ও রোগবালাই দমনের ব্যয় অনেক বেশি।

খরিফ-১, খরিফ-২ ও রবি মৌসুম

চাষাবাদ পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকায়নের ফলে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রচলিত রবি ও খরিপ ঋতুর ধারণাকে পুনবিন্যাস করে তিনটি শস্য মৌসুমে ভাগ করেছেন। এগুলো হল খরিপ-১, খরিপ-২ বা বর্ষা মৌসুম ও রবি মৌসুম ।

খরিফ-১ : এই মৌসুমের বিস্তৃতি মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত। এই মৌসুমে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে তাপমাত্রা থাকে অধিক। শস্য উৎপাদনের জন্য সেচের প্রয়োজন অল্প। এই সময়ে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য থাকে প্রায় সমান সমান। শিলাবৃষ্টিতে শস্যহানির আশঙ্কা বেশি থাকে। আউশ ধান, পাট, ভূট্টা, কাউন, তিল, মিষ্টি কুমড়া প্রভৃতি খরিপ-১ মৌসুমের ফসল।

খরিফ-২ : এই মৌসুমের বিস্তৃতি জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ প্রচুর। বায়ুমন্ডলে এই সময়ে আর্দ্রতা থাকে অনেক বেশি। প্রায় সারাক্ষণই আকাশ থাকে মেঘাচ্ছন্ন। শস্য উৎপাদনের পানিসেচের কোন প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে আবদ্ধ পানি অপসারণের জন্য নিষ্কাশনের প্রয়োজন হতে পারে। এই সময়ে ফসলে পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের উপদ্রব বেশি হয়। আমন ধান, ভূট্টা, মাসকলাই, মুগকলাই, প্রভৃতি খরিফ-২ মৌসুমের ফসল।

রবি মৌসুম : এই মৌসুমের বিস্তৃতি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এই মৌসুমে বৃস্টিপাতের পরিমাণ নগন্য। শস্য উৎপাদনের জন্য এই ঋতুতে পানি সেচের প্রয়োজন হয়। এই ঋতুতে পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের উপদ্রব কম। বন্যা, শিলাবৃষ্টি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কাও কম। গম, গোলআলু, মিষ্টি আলু, তামাক, মরিচ, বেগুন, সরিষা, মুগ, মসুর, ছোলাম, পিঁয়াজ, রসুন, চিনাবাদাম, টমেটো, কপি, বোরো ধান প্রভৃতি রবি মৌসুমের ফসল।

শিক্ষার্থীর কাজ	ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন রবিশষ্য ও খরিপ শস্যের মধ্যে তুলনা আলোচনা করবেন?

সারাংশ

আলোর স্থিতিকালের অনুসারে- আলোক সংবেদনশীল উদ্ভিদ ও আলোক অসংবেদনশীল উদ্ভিদ ভাগ করা হয়। আলোকে সংবেদনশীল উদ্ভিদ দুই প্রকার খাটো দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ বা দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ। খাটো দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ যেমন: শীতকাল ফুলকপি, বাধাকপি, তামাক, সয়াবিন, চন্দ্রমল্লিকা। দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যের উদ্ভিদ আলু, লেটুস, মটর যব ইত্যাদি। দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ ফসল যেমন- চিনাবাদাম, টমেটো, মরিচ, ঢেঁড়স, ভুট্টা ইত্যাদি। শস্য মৌসুমকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রবিমৌসুম খরিপ মৌসুম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দিবা দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ফসলকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) কোন ভাগ নেই।

২। আলোক সংবেদনশীল ফসলকে বলা হয়-

ছোট দিনের উদ্ভিদ

বড় দিনের উদ্ভিদ

দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৭ ব্যবহারিক : বায়ুর তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নির্ণয়

(ক) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করণ জানতে পারবেন

মূলতত্ত্ব : ফসল উৎপাদনের জন্য স্থায়ী তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের ভূমিকা অপরিহার্য। এ সকলের ভিত্তিতেই কোনো এলাকায় শস্যের জাত নির্বাচন করা হয়। এ কারণেই স্থানীয় তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মাসিক ও বার্ষিক হিসাব রাখা প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে এ সবের পরিমাণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পাঠ থেকে তোমরা সে সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখতে পারবে।

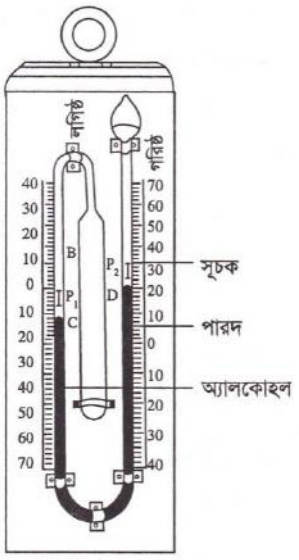

চিত্র ৬.৭.১ : গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

ক. গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ তাপমান যন্ত্র।

খ. একটি কাঠের বোর্ড।

গ. প্রয়োজনীয় খাতা কলম ইত্যাদি।

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার দুটি কাঠ বা ধাতু নির্মিত বোর্ডে সমান্তরালভাবে আটা থাকে। একটি স্টিভেনশন স্ক্রিন যুক্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে বোর্ডটি এমনভাবে বসানো থাকে যাতে থার্মোমিটার দুটি বায়ুমন্ডলের তাপের সংস্পর্শে থাকে কিন্তু সূর্যের আলো সরাসরি এর উপর পড়তে না পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয়। থার্মোমিটার নলের মধ্যে পারদের উপরের শেষ প্রান্তে লৌহ নির্মিত একটি সূচক থাকে। দিনের তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পারদের আয়তন বেড়ে যায় এবং সূচকটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর তাপমাত্রা কমে গেলে পারদ নেমে আসে কিন্তু সূচকটি সেখানে থেকে যায়। সূচকের এরূপ অবস্থান দেখে সর্বোচ্চ তাপের পাঠ নেওয়া যায়।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোমিটার পারদের পরিবর্তে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। থার্মোমিটারের নলে স্প্রিংযুক্ত একটি সূচক থাকে, সূচকটিকে অ্যালকোহলের উপরের পৃষ্ঠের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দিনের তাপমাত্রা কমতে থাকলে অ্যালকোহলের সংকোচনের কারণে সূচকটি নামতে থাকে। পুনরায় তাপমাত্রা বাড়লে অ্যালকোহলের আয়তন বেড়ে যায়। কিন্তু সূচকের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। সূচকের এ অবস্থা দেখে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

কাজের ধাপ :

১. তাপমাপক যন্ত্র একটি নির্ধারিত স্থানে দন্ডের সাথে স্থাপন কর।

২. এবার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড কর।

ফলাফল :

D নলের স্কেলের সূচকটির নিম্নাংশের ও স্কেলে কাটা দাগের পাঠ যা পাওয়া যায় তাই ঐ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। মনে করি, ইহা ২০° সেলসিয়াস। একইভাবে c নলের স্কেলের সূচকটি নিম্নাংশের অবস্থান ও স্কেলে কাটা দাগের মিলনস্থলের যে পাঠ পাওয়া যাবে তা ঐ দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। মনে করি ইহা ১৭° সেলসিয়াস।

খ) বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমি জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পারবেন; বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয় করতে পারবেন।

মূলতত্ত্ব : বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকলে তাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। কোন নির্দিষ্ট তাপ ও চাপে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে, তার সাথে ঐ তাপ ও চাপো বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে তার অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। এটি সর্বদা শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যেমন-

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{বায়ুতেজলীয় বাষ্পের ধারণ করার ক্ষমতা}} \times ১০০$$

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর এ আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় তাকে আর্দ্রতামাপক যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার বলা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণত শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্ব হাইগ্রোমিটার ব্যবহার করা হয়।

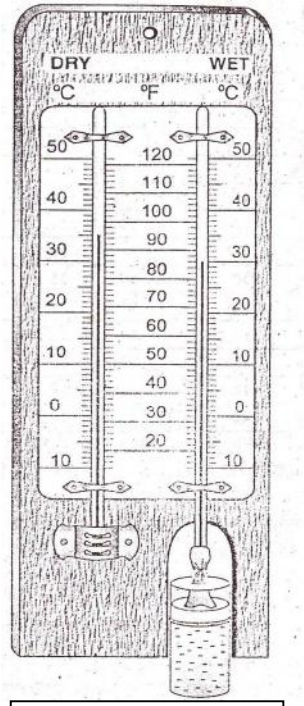

চিত্র ৬.৭.২ : শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্ব হাইগ্রোমিটার

আর্দ্রতামাপক যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার :
এ যন্ত্রে দুইটি পারদ থার্মোমিটার পাশপাশি কাঠের ফ্রেমে উল্লম্ববাবে লাগানো থাকে। থার্মোমিটারগুলির একটি A ও অন্যটি B দ্বারা চিহ্ন করা হয়েছে। A থার্মোমিটার বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। B থার্মোমিটারের নিচের অংশে একটি মসলিন পলতে জড়ানো থাকে এবং এটি একটি পাত্রে পরিষ্কার পানির মধ্যে ডুবানো থাকে। পানি পলতে বেয়ে উপরে ওঠে এবং B থার্মোমিটারের বাল্বকে সবসময় সিক্ত রাখে। মসলিন পলতে থেকে পানি বাষ্পায়িত হয়। ফলত সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটার শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের চেয়ে কম তাপমাত্রা প্রদর্শন করে। দুই থার্মোমিটারে তপমাত্রার ব্যবধান বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। আর্দ্রতা যত কম হবে বাষ্পায়ন তত দ্রুত হবে, সিক্ত বাল্ব থার্মোমিটারের তাপমাত্রা তত কম হবে। ব্যবধান কম হলে বোঝা যাবে বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা বেশি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (১) শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্ব হাইগ্রোমিটার, (২) রেনোর সম্পৃক্ত জীলয় বাষ্প চাপের তালিকা ও (৩) কাগজ কলম

কাজের ধাপ : (১) যন্ত্রটি নাড়া চাড়া না করে শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তায় বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা প্রদর্শনকারী থার্মোমিটারের পাঠ দেখ।

(২) আর্দ্র-সিক্ত থার্মোমিটারের পাঠ পর্যবেক্ষণ কর।

(৩) উভয় পাঠের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(৪) রেনোর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার আলোকে সর্বোচ্চ জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয় কর।

(৫) দুই থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শুষ্ক থার্মোমিটারের তাপমাত্রার আলোকে পাঠ নির্ণয় কর।
(৬) এবার সূত্রের সাহায্যে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় কর।

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{শুষ্ক থার্মোমিটার এর পাঠে তাপমাত্রার পার্থক্য জনিত জলীয় বাষ্প চাপ [মিলিমিটার-পারদ একক]}}{\text{শুষ্ক থার্মোমিটার-এর পাঠ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ জলীয় বাষ্প চাপ}} \times ১০০$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপোর তালিকা :
[রেনোর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপের তালিকা (মিলিমিটার পারদ একক)]

শুষ্ক থার্মোমিটার এর পাঠ সেলসিয়াস	শুষ্ক ও আর্দ্র থার্মোমিটার এর পাঠের পার্থক্য (সেলসিয়াস)										
	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (মি.লি.)										
৭	৭.৫	৬.৫	৫.৫	৪.৬	৩.৭	২.৮	১.৯	১.১	০.২		
৮	৮.১	৭.০	৬.০	৫.০	৪.১	৩.২	২.৩	১.৪	০.৬		
৯	৮.৬	৭.৫	৬.৫	৫.৫	৪.৫	৩.৬	২.৭	১.৮	০.৯	০.১	
১০	৯.২	৮.১	৭.০	৬.০	৫.০	৪.০	৩.১	২.২	১.৩	০.৪	
১১	৯.৯	৮.৭	৭.৬	৬.৫	৫.৫	৪.৫	৩.৫	২.৬	১.৭	০.৮	
১২	১০.৫	৯.৩	৮.২	৭.১	৬.০	৫.০	৪.০	৩.০	২.১	১.২	০.১
১৩	১১.২	১০.০	৮.৮	৭.৭	৬.৬	৫.৫	৪.৫	৩.৫	২.৫	১.৬	০.৭
১৪	১২.০	১১.৭	৯.৫	৮.৩	৭.২	৬.১	৫.০	৪.০	৩.০	২.০	১.১
১৫	১২.৮	১১.৫	১০.২	৯.০	৭.৮	৬.৭	৫.৬	৪.৫	৩.৫	২.৫	১.৫
১৬	১৩.৬	১২.৩	১১.০	৯.৭	৮.৫	৭.৩	৬.২	৫.১	৪.০	৩.০	২.০
১৭	১৪.৫	১৩.১	১১.৮	১০.৫	৯.২	৮.০	৬.৮	৫.৭	৪.৬	৩.৫	২.৫
১৮	১৫.৫	১৪.০	১২.৬	১১.৩	১০.০	৮.৭	৭.৫	৬.৩	৩.২	৪.১	৩.০
১৯	১৬.৫	১৫.০	১৩.৫	১২.১	১০.৮	৯.৪	৮.২	৭.০	৫.৮	৪.৬	৩.৫
২০	১৭.৭	১৬.০	১৪.৫	১৩.০	১১.৬	১০.২	৮.৯	৭.৭	৬.৫	৫.৩	৪.১

উদাহরণ : একজন ছাত্র আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিরূপণের সময় শুষ্ক থার্মোমিটার পাঠ ১৯° সে. এবং আর্দ্র থার্মোমিটারের পাঠ ১৬° সে. পেয়েছে। এ অবস্থায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কীরূপ হবে ?
উত্তর : শুষ্ক থার্মোমিটার-এর পাঠ ও আর্দ্র থার্মোমিটার এর পাঠের পার্থক্য ৩। কাজেই উভয় পাঠের পার্থক্যজনিত মান এর বাষ্পচাপ ৩ এর কলাম থেকে ১৯° সে. এর সারি বরাবর মান হল ১২.১ এবং শুষ্ক থার্মোমিটার এর পাঠ ১৯° সে. এর বাষ্পচাপ হল ১৬.৫।

অতএব, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা $= \frac{১২.১}{১৬.৫} \times ১০০ = ৭৩.৩\%$ (প্রায়)।

সাবধানতা : (১) আর্দ্রতামাপক যন্ত্র খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।
(২) যন্ত্রের পাঠ নিখুঁতভাবে নিতে হবে।
(৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপের তালিকার ব্যবহার ভালভাবে শিখতে হবে।

পাঠ-৬.৮ ব্যবহারিক : বিভিন্ন ধরনের দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ ফসল ও ফসলের জাত চিহ্নতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমি জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ ফসল ও ফসলের জাত চিহ্নতকরণ ।

মূল তত্ত্ব : দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সারা বছর সমান থাকে না। বছরের কখনো দিন ছোট ও রাত বড় আবার কখনো রাত ছোট ও দিন বড় হয়। আমাদের দেশে শীতকালে দিন ছোট ও রাত বড় এবং গ্রীষ্ম কালে দিন বড় ও রাতে ছোট হয়। দিবাকালের দীর্ঘতার উপর ভিত্তি করে পুষ্পক উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ছোট দিনের উদ্ভিদ, বড় দিনের উদ্ভিদ ও দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(ক) গবেষণার জন্য একটি ফসলের মাঠ (খ) গবেষণা মাঠে বিভিন্ন ফসলের জাত। যেমন- গোল আলু, আখ, শিম, ঝিঙা ও পালংশাক। (গ) কাগজ কলম ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি

১. এ পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রথমে একটা নির্দিষ্ট ফসল চাষের মাঠ নির্বাচন করতে হবে।

২. এবার ঐ মাঠকে বহু প্লটে ভাগ করে এক একটি প্লটে এক এক রকম ফসলের চাষ করতে হবে।

৩. গ্রীষ্মকালে যে সব ফসলের চাষ হয় সেগুলোকে গ্রীষ্মকালে চাষ করতে হবে এবং সেসব ফসলের উপর আলোর প্রভাব লক্ষ্য করতে হবে।

৪. অনুরূপভাবে যে সব ফসল শীতকালে চাষ হয়ম সেগুলো শীতকালে চাষ করে লক্ষ্য করতে হবে যে তাদের ফুল ফল কোন সময়ে উৎপাদিত হয়।

৫. আবার কিছু ফসলকে বছরের যে কোন সময় লাগিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে তাদের ফুল ফল কোন সময়ে হয়। অর্থাৎ আলোক দৈর্ঘ্যের উপর তাদের কোনো প্রভাব আছে কিনা।

উপর্যুক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে নিম্নের পর্যবেক্ষণ তারিকা দেখে ফসলের দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ জাত চিহ্নিত কর।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ	স্বল্প দিবা উদ্ভিদ	দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ উদ্ভিদ
১। বড় দিন ছোট রাত-পুষ্পের ধারণ ঘটে। ২। ছোট দিন বড় রাত-পুষ্পের ধারণ ঘটে না। উদাহরণ : গম, তুলা, বীট, যই, রাই ইত্যাদি।	১। বড়দিনে-ছোট রাত-পুষ্পের ধারণ ঘটে না। ২। ছোট দিন-বড় রাত পুষ্পের ধারণ ঘটে। উদারহরণ আম, আলু, সিম, পাট, তামাক, সূর্যমূখী আখ, রোপা আমন ইত্যাদি।	১। বড়দিন-ছোট রাত বা ছোট দিন বড় রাত এর উপরে ফুল এবং ফল ধারণের উপর কোনো প্রভাব নেই এবং সর্বক্ষণ আলোক প্রদান সইতে এদের পুষ্প ধারণে কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-টমেটো, তুলা, সূর্যমুখী, কুমড়া ইত্যাদি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। "মৌসুমি জলবায়ু" আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কোন বছর এর ব্যতিক্রম হলে ফসলহানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মৌসুমি জলবায়ুর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

ক) ফসলের আলোক সংবেদনশীলতা বলতে কি বুঝ ?

খ) দিবা দৈর্ঘ্য নিরপেক্ষ ফসলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জলবায়ু কিভাবে ফসলহানি ঘটাতে পারে-ব্যাখ্যা কর ?

ঘ) উক্ত জলবায়ুর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমানোর উপায় উদ্ভাবন কর।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ : ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ : ১। ক ২। ক